প্রত্নচিহ্ন -র পরবর্তী সংখ্যার জন্য লেখা পাঠান। লেখা পাঠানোর শেষ তারিখ ১৬ এপ্রিল ২০২১। লেখা পাঠানোর জন্য যোগাযোগ করুন 8942924234 এই নম্বরে। E-mail : ab.farque@gmail.com

অতীত খুঁড়ে ইতিহাস উদ্ধার

# প্রত্নচিহ্ন

E-MAGAZINE

ব্যক্তিগত বিতরণের জন্য

লেখকের বক্তব্য নিজস্ব। এজন্য প্রত্নচিহ্ন কমিটি কোনভাবে দায়ী নয়।

দ্বিমাসিক ৪ পাতা

১ম বর্ষ - ৫ সংখ্যা ❑ ২০ ফাল্গুন, শুক্রবার, ১৪২৭ সন ❑ ৫ মার্চ, ২০২১

## পৃথিবীর তিনটি রহস্যময় প্রত্নকীর্তি

অভিষেক ঘোষ

আজ যা বর্তমান ---- আগামীকাল তা অতীত। আর এই নিয়মেই অবিরত দীর্ঘ হয় মানবসভ্যতার ইতিহাস। রচিত হয়, বিবর্তিত হয়, রূপান্তরিত হয়, সংযোজিত হয়, তেমনি বিস্মৃতও হয়। ইতিহাসের নানা পর্বকালের নিয়মে, মানুষের উদাসীন অবহেলায় হারিয়ে যায়। এভাবে লুপ্ত হয়ে যাওয়া ইতিহাসের ফাঁকগুলোতেই ভবিষ্যতের মানুষ বারেবারে বসিয়েছে কল্পনার নুড়ি-পাথর, সত্যের ফাঁকগুলো ভরাট করতে। আর এভাবেই জন্ম হয়েছে উপকথার। তার কিছুটা ইতিহাস আর বাকিটা অনুমান নির্ভর কল্পনা মাত্র। কিন্তু এই বিরাট পৃথিবী জুড়ে এমন অজস্র ঐতিহাসিক নিদর্শন ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, যার সামনে দাঁড়িয়ে মানুষের কল্পনা স্তব্ধ হয়ে যায়, অনুমানক্ষমতা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে অবিশ্বাসে, প্রত্যয় পরিণত হয় দ্বিধায়। এই নিবন্ধে আমরা তেমনই তিনটি রহস্যময় প্রত্ন নিদর্শনের মুখোমুখি হবো।

১) **স্টোনহেঞ্জ** ঃ ইংল্যান্ডের উইল্টশায়ার অঞ্চলে অবস্থিত, বৃত্তাকার ভারী পাথরে নির্মিত প্রাগৈতিহাসিক এই প্রত্ন নিদর্শন আজ যেন এক রহস্যঘন বিস্ময়। প্রত্নতাত্ত্বিকদের অনুমান, নব্য প্রস্তর যুগের অন্তিমপর্বে নির্মিত মূল স্টোনহেঞ্জ-টি আদতে আরো বিস্তৃত ছিল। বর্তমান আয়তনের অন্তত ১৫ গুণ বড়ো ছিল সেটি। এর বলয়াকার নির্মাণ দেখলে প্রথম দর্শনেই মনে হবে, এটি নির্ঘাত কোনো উপাসনাস্থল। বস্তুত এটি ছয়টি পর্বে নির্মিত হয়। প্রথম পর্বে (আনুমানিক ৩০০০-২৫০০ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দ) 'ড্রুইডস' - নামধারী এক প্রাচীন কেল্টিক যাজক শ্রেণি সূর্য উপাসনা ও দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ স্থান রূপে এর নির্মাণ শুরু করেন — সপ্তদশ শতকের খ্যাতনামা প্রত্নবিদ জন অব্রে অন্তত তেমনটাই দাবি করেছিলেন। বর্তমানে হেঞ্জের সবচেয়ে বড়ো পাথরগুলি নাম দেওয়া হয়েছে, 'সার্সেনস্'। এগুলি গড়ে ৩০ ফুট লম্বা, ৭ ফুট চওড়া এবং একেকটির ওজন ২৫ টন। কিন্তু এগুলি নেহাৎ-ই স্যান্ডস্টোন বা বেলেপাথর। ২৫-৩০ মাইল দূরে অবস্থিত আজকের ইংল্যাণ্ড থেকে সলিসব্যুরি প্লেইন অবধি পাথরগুলিকে বহন করে আনা হয়েছিল বলেই অনুমান। রহস্য হলো এর 'ঘোড়ার নাল' - আকারের অন্তবর্তী বলয়ের নীলচে পাথরগুলি। ছোট পাথরগুলি অর্থাৎ নীল পাথর (blustone)-গুলোর ওজন প্রায় ৪ টন পর্যন্ত। পাথরগুলোর নাম 'ব্লু-স্টোন', কারণ সেগুলো ভাঙলে বা ভেজালে নীলচে একরকম আভা দেখা যায়। এই পাথরগুলো আগ্নেয় পাথর, ১৬০ মাইরল (প্রায় ২৬০ কিলোমিটার) দূরে অবস্থিত পশ্চিম ওয়েলস-এর বিভিন্ন স্থান থেকে আনা হয়েছিল বলেই অনুমান। কিন্তু এখনও অজানা যে, প্রাগৈতিহাসিক পর্বে কোন প্রযুক্তি ছাড়া কিভাবে এই পাথরগুলো তারা এতদূর থেকে এনেছিল! অন্তিম অর্থাৎ ষষ্ঠ পর্বে (১৬৪০-১৫২০ খ্রিঃ পূঃ) -এর নির্মাণপর্ব সমাপ্তির আগেই বৃত্তাকারে নীল পাথরগুলি সংস্থাপন

এরপর ৪ পৃষ্ঠায় ▸

## 'রাঙানটে' — একটি আদিম "যাদু বিশ্বাস"

ড. সুপম মুখার্জী

বিভাগীয় প্রধান ইতিহাস বিভাগ, এম.সি.বি.সি. কলেজ, লালবাগ

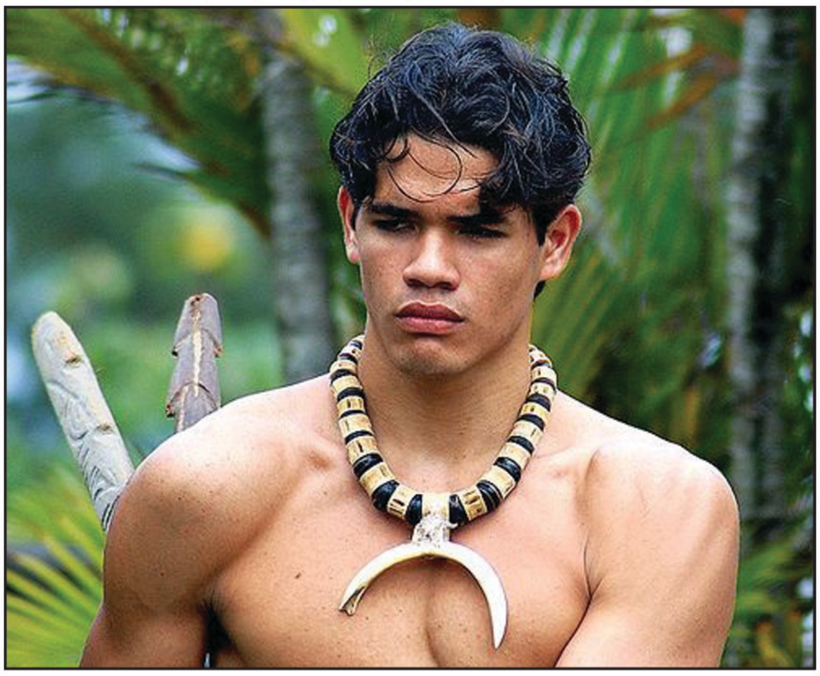

ভারতবর্ষ মূলত কৃষি, প্রধান দেশ। আর বাংলাদেশের বেশির ভাগ মানুষই কৃষির উপর নির্ভরশীল। ফলে গ্রীষ্মকালের জলের অভাবে চাষের ক্ষতি হয়। আর এমন হলে বর্ষার দিকে চেয়ে থাকা মানুষের মধ্যে কিছু মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। গ্রামের একদল মানুষ নিজেদের মত করে ঈশ্বরের কাছে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা জানাতে থাকে, তেমনি কতিপয় শিক্ষিত মানুষ আবহাওয়া দপ্তরের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে — কতদিনে বর্ষার পরিবেশ সৃষ্টির খবর মিলবে। কিন্তু এই দুই ধরনের মানুষের প্রতিক্রিয়া ছাড়াও কিছুকাল আগে পর্যন্তও ব্যাপক পরিমানে আর একটি প্রতিদিন চোখে পড়ত — যার জন্ম মূলত "যাদু বিদ্যা" জাতীয় ধারনার মধ্য থেকে। এমনি একটি চিন্তার বহিঃপ্রকাশ হল 'রাঙানটে'। এই 'রাঙানটে' যদিও অপভ্রংশ হয়ে 'আঙানটে' নামেই গ্রাম সমাজে অধিক প্রচলিত।

মূলত অবিবাহিত মেয়েরা কোন একটি বাড়িতে ছন্নাতলা সাজিয়ে তাকে আলপনা বা লালমাটি দ্বারা সাজিয়ে সেই ছন্নার মাকে দুটো গর্ত করে, তার মধ্যে দুটো সোনা ব্যাঙ এনে রাখতো। আর ঐ গর্তে গ্রামের সাতটি পুকুরের জল রাখতো এবং গর্তের মুখে একটি করে মাটির সড়া চাপা দিতো। তারপর ঐ গর্তের পাশে একটি সাদানটে গাছকে বর সাজিয়ে রাখতো। এরপর মেয়েরা কুলোর মধ্যে ফুল দিয়ে সাজিয়ে ঐ নটে গাছ দুটিকে নিয়ে লোকের বাড়ির দরজায় যেতো এবং গান গেয়ে ("আল্লা মেঘ দে, পাণি দে-ছায়াদেরে আল্লা মেঘ দে...") চাল-পয়সা চেয়ে আনত। তারপর ঐ সংগৃহিত সামগ্রী দিয়ে খিচুড়ি রান্না করে সকলে মিলে পংক্তি ভোজন করতো এবং সবশেষে তিনদিনে অনুষ্ঠান শেষ হলে নটেগাছ দুটিকে পুকুর পাড়ে মাটিতে বসিয়ে তাতে জল দিতো এবং ব্যাঙ দুটিকে পুকুরে ছেড়ে দিতো। তারপর পুকুর পাড়ে সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে বৃষ্টির নকল করে জল ছিটিয়ে দিতো। এদের এ কাজের উদ্দেশ্য ছিল, যে ব্যাঙ এবারে চিৎকার করবে আর সদ্য বিবাহিত নটেগাছ দুটিকে বাঁচাতে ব্যাঙের চিৎকারে আকাশে অচিরেই মেঘের সঞ্চার হবে এবং বৃষ্টিপাত ঘটবে।

বলাবাহুল্য এরকম করলে বৃষ্টি সত্যি-সত্যিই হতো কিনা, সে প্রশ্নের থেকেও বিষয়টি বড় তাহল গ্রীষ্মের শুখা মরসুমে এই ধরনের ব্যবস্থা কিভাবে গ্রামে শুরু হয়েছিল? অকালে বিজ্ঞানের যক্তিবাদ ও বিশ্ব নিয়ন্তার

এরপর ২ পৃষ্ঠায় ▸

## সম্পাদকীয়

কিছুদিন আগে গোটা বিশ্বজুড়ে পালিত হলো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। কিন্তু আমরা অনেকেই হয়তো জানি না আমাদের রাজ্যের একটি জেলার সৃষ্টি হয়েছিল ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। না বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। এই আন্দোলন মানভুমের ভাষা আন্দোলন, আর জেলার নাম পুরুলিয়া।

বঙ্গভঙ্গ রদের পর ১৯১২ সালে বিহার-ওড়িশা মিলিত রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় মানভূম, যা মূলত বাংলাভাষী অঞ্চল। ঝড় উঠলেও স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য তা তখন চাপা পড়ে যায়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৪৮ -এ হিন্দি ভাষাকে জোড় করে বাংলার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হলে ভারতে শুরু হয় প্রথম ভাষা কেন্দ্রিক আন্দোলন। স্কুল থেকে বাংলা তুলে নেওয়া হয়, সর্বত্র হিন্দি শেখানো শুরু হয়, যার প্রতিবাদে সর্বস্তরের মানুষ আন্দোলনে যুক্ত হয়। আন্দোলন একসময় হিংসাত্মক রূপ নিলে হাজারের বেশি মানুষকে কারাগারে বন্দী করা হয়। আন্দোলন বড় আকার ধারণ করলে ১৯৫৫ সালের ১০ই অক্টোবর প্রথম ১৯টা থানা নিয়ে পুরুলিয়া গঠনের কথা বলা হয়। পরে ১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর ১৬টি থানা নিয়ে পুরুলিয়া পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয়। মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধ সম। তাই আমাদের প্রত্যেকের উচিৎ মাতৃভাষাকে তার প্রাপ্য সম্মান দেওয়া। বিদেশী ভাষা শেখার প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই আছে। তার মানে এটা কখনোই নয় যে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মাতৃভাষা শেখার থেকে বঞ্চিত করবো।

## রেশম কথা

*(গত সংখ্যার পর)*

**নিত্যগোপাল মণ্ডল**

ভারতবর্ষে চাষ করা রেশম মূলত দুই প্রকার তুঁত ও অতুঁত। অতুঁত রেশম আবার তিন প্রকার তসর, মুগা, এণ্ডি ও এড়ি। তুঁত রেশম যা চীন দেশ থেকে আমদানীকৃত তাতে কোনো বৈচিত্র ছিলনা। সব রেশমই ছিল সাদা রঙের অন্যদিকে বাংলার অতুঁত রেশমের ছিল অতুলনীয় বৈচিত্র। অর্থশাস্ত্র থেকে জানা যায় নাগবৃক্ষ (নাগকেশর) পাতা খাওয়া পোকা থেকে হলুদ রঙের রেশম। লিকুচের পাতা খাওয়া পোকা থেকে গমের রঙের রেশম, বকুল থেকে সাদা রেশম এবং বট ও অন্যান্য গাছের পাতা খাওয়া পোকা থেকে ননীর মতো রঙের রেশম পাওয়া যেত এই জন্যই কৌটিল্য বলেছেন সুবর্ণকুড্যের 'পত্রোর্ণ' সবচেয়ে ভালো।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে সুবর্ণকুড্য হল বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার কর্ণসুবর্ণ ও তার সন্নিহিত অঞ্চল। তিনি বলেছেন "প্রাচীন টীকাকার বলেন সুবর্ণকুড্য কামরূপের নিকট কিন্তু কামরূপের নিকট যে রেশম এখন হয় তা ভেরেণ্ডা পাতায় হয়। আমি বলি সুবর্ণকুড্য নাম শেষে কর্ণসুবর্ণ হয়। এখানে এখনো রেশমের চাষ হয় এবং এখানকার রেশম খুব ভালো... চীনের রেশম তুঁত গাছ হইতে হয়। বাংলার রেশমের তুঁত গাছের সহিত কোনো সম্পর্কই নায়। সুতরাং বাঙালী যে রেশমের চাষ চীন হইতে পাইয়াছে একথা বলিবার জো নাই এখন পরিস্কার করিয়া বলিতে হইলে একথা বলিতে হইবে যে, রেশমের চাষ বাংলাতেও ছিল, চিনেও ছিল"।

অর্থশাস্ত্রের 'কোষপ্রবেশরত্ন পরীক্ষা' অধ্যায়ে কোন কোন রত্ন রাজকোষে জমা রাখতে হবে তার তালিকাতে হীরা জহরৎ এর সাথে সুন্দর, নরম রেশমী কাপড়ের ও উল্লেখ আছে। এই রেশম কাপড়কে এখানে 'চীনপট্ট' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তৎকালীন 'সীন' রাজবংশ থেকে সম্ভবত 'চীন' কথাটি এসেছে। এর থেকেই বোঝা যায় মুর্শিদাবাদে রেশম এসেছে খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের আগেই। মুর্শিদাবাদ জেলা সিল্ক উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয় স্থানে ছিল সতেরো শতকে ভারতের মধ্যে সর্বোচ্চ সিল্ক উৎপাদনের এটি বৃহৎ স্থান অধিকার করেছিল। ইংরেজ সিল্ক ব্যবসায়ীদের কাছে কাশিমবাজার ছিল একটি সিল্ক ক্রয়ের বড় কেন্দ্র।

এবার আসা যাক কোন পথ দিয়ে এবং কীভাবে ভারতে রেশমের বিস্তার লাভ ঘটে সেই প্রসঙ্গে। বৈদিক ইতিহাস থেকে জানা যায় হিন্দুরা রেশমের ব্যবহার বহু আগে থেকেই জানতেন। তবে চীনের রেশম ভারতে আসে ভুটান এবং সিকিম থেকে এই সাথে আসে রেশম চাষের গোপনীয় কৃৎকৌশলটিও। এই পথকেই পণ্ডিতরা Silk Route (সিল্করুট) বলে চিহ্নিত

এরপর ৪ পৃষ্ঠায় ▶

## 'গোয়াস' মুর্শিদাবাদের এক প্রাচীন জনপদ ঃ একটি পর্যালোচনা

**ফারুক আব্দুল্লাহ**

*(গত সংখ্যার পর)*

গোয়াস গ্রামে কয়েক বছর আগেও প্রচুর উঁচু উঁচু ঢিবি দেখা যেত। এই ঢিবিগুলি সম্পর্কেও নানান কাহিনী প্রচলিত রয়েছে এলাকায়, একটি মত অনুযায়ী মহামারীর সময় প্রচুর মানুষ মারা যায় এবং তাদের দাহ না করে মৃতদেহগুলি মাটি চাপা দেওয়া হয়, মনে করা হত যে এই সমাধিগুলির ওপর মাটি দেওয়া পূর্ণের কাজ ফলে পরবতী সময়ে দীর্ঘদিন ধরে সমাধিগুলিতে মাটি দেওয়ার ফলে সেগুলি নাকি ঢিবির আকার ধারণ করে। অপর একটি মত হল গোয়াসে একটি সময় বারুই জাতির বাস ছিল, এরা মূলত পান চাষ করত এবং গোয়াসের পান ছিল খুব নামকরা। পানচাষ করতে প্রয়োজন হয় উঁচু জমির, তাই অনুমান করা হয় যে এই ঢিবিগুলি ছিল আসলে পান খেত, পরবর্তী সময়ে মহামারীতে সমগ্র জনপদটি জনশূন্য হয়ে পড়লে এই পান খেতগুলিও পরিত্যক্ত হয়ে উঁচু ঢিবিতে পরিণত হয়। তবে বর্তমানে এইসব প্রাচীন ঢিবিগুলি ইঁট ভাটার মালিকরা চড়া দামে কিনে নেওয়ার এইসব নিদর্শনও শেষ হয়ে গেছে।

গোয়াস শহরটি ধ্বংস হয়ে গেলে শহরের একটি বড় অংশ জঙ্গলে ঢেকে যায়। পরবর্তীতে এইসব জঙ্গল কেটে চাষের জন্য জমি তৈরি করা হয় এবং বসতি স্থাপন করা হয় ফলে জমিতে কর্ষণ করতে গিয়ে, নতুন বাড়ি তৈরি করতে গিয়ে কিম্বা মাটি খোঁড়া খুঁড়ি করতে গিয়ে এখনও অনেক সময় প্রাচীন ঘরবাড়ির ভগ্নাবশেষের সন্ধান মেলে, আবার কখনও মেলে কলসি ভর্তি মুদ্রা, পুরানো বাসনপত্র।

গ্রামের প্রবীণ ব্যক্তিদের অভিজ্ঞতা ও বংশ পরম্পরায় শুনে আসা বিভিন্ন ঘটনাক্রমের মাধ্যমে এই প্রাচীন জনপদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সমৃদ্ধি এবং পতন সম্পর্কে বহু অজানা তথ্য উঠে আসে যা জনপদ সম্পর্কে জানার ক্ষেত্র তথ্যের স্বল্পতা অনেকটাই দূর করে। *(শেষ)*

▶ ১ পৃষ্ঠার পর

## 'রাঙানটে' — একটি আদিম "যাদু বিশ্বাস"

দ্বারা সমস্যা সমাধানের যে চিন্তা মানুষ করে তার পাশাপাশি এই প্রকৃতি বিশ্বাস নির্ভরতা একটি স্বতন্ত্র ঘটনা। মূলত আদিবাসী সমাজের মধ্য থেকেই এই বিশ্বাসের জন্ম হয়েছিল। তার 'Savagery' থেকে 'Barbarism' হয়ে 'Civilisation' এর স্তরে উন্নীত মানুষের মধ্যেও যে বিশ্বাস বা আচরণের প্রভা থেকেই যায় এটি তারই অন্যতম। বিষটি আরেকটু পরিস্কার করে বললে বলা যায় যে, অ্যারিস্টোটল পূর্ব সময় থেকে — লামার্ক; ডারউইন প্রমুখ বিজ্ঞানীগণ যখন পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষালব্ধ জ্ঞানের আলোকে --- পরিবেশ, ব্যবহার-অব্যবহার বিধি ও অঙ্গ সঞ্চালনের বক্তব্য উত্থাপন করে প্রাকৃতিক বিবর্তনবাদকে ব্যাখ্যা করেছেন। তখনই হেনরী লুইস মর্গানের মতো আমেরিকান বৈজ্ঞানিক 'রেড ইণ্ডিয়ান, পলিনসিয়ান, অস্ট্রোলিয়ান, উপজাতীদের নিয়ে গবেষণা করে মানুষের Ancient Society -র Cultural Evolution কে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি "Researches in the lines of Human Progress from Savagery thorugh Barbarism to Civilisation (1877), The league of the Erocoa (1851) -এর মত বিখ্যাত গবেষণা মূলক গ্রন্থে এই সাংস্কৃতিক বিবর্তনকে তুলে ধরেছেন অত্যন্ত দক্ষতার সাথেই।

সভ্যতার বিবর্তনের ক্ষেত্রে মর্গান যে স্তরগুলির কথা বলেছেন তাঁর পাশাপাশি কোন জাতি কোন স্তরে আটকে রয়েছে তাও তিনি দেখিয়েছেন। তিনি আশ্চর্যের সঙ্গে একটি নিয়মের দ্বারা স্তরগুলিকে পরস্পর বিন্যস্ত হতে দেখেছেন। কাজেই যারা ওপরের ধাপে পৌছেছে তারাও একদিন নিচের ধাপে ছিল বলে তিনি প্রমাণ পান। এদের মধ্যে যাদের তিনি প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেয়েছিলেন তাদের মধ্যে সবচেয়ে নিচুস্তরে ছিল আস্ট্রেলিয়ার পলিনেশিয়ার আদিবাসীরা। যারা বন্যদশা বা Savagery পর্বের মধ্যস্তরে অবস্থান করতো এবং আগুন আবিষ্কার থেকে তীরধনুক আবিষ্কারেই যে স্তরের সীমানা নির্দিষ্ট ছিল। বন্যদশার উচ্চ বা শেষ স্তরে ছিল কলোম্বিয়া উপত্যকার উপজাতীরা, যারা তীরধনুক থেকে শুরু করে মাটির পাত্র আবিষ্কার করতে শিখেছিল। *(ক্রমশ)*

# বাংলা-বাঙালি-বাংলাদেশ একটি পর্যালোচনা

ড. রাজর্ষি চক্রবর্ত্তী, ইতিহাস বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

(গত সংখ্যার পর)

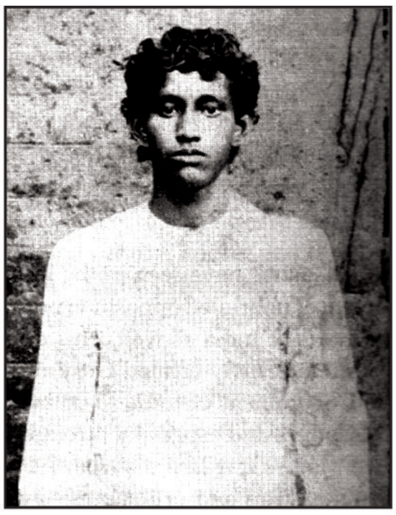

১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে আবার বাঙালির আবেগ প্রজ্জ্বলিত হয়। স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনে সমগ্র বাংলা উত্তাল হয়ে ওঠে। ব্রিটিশ শাসকরা দমননীতি প্রয়োগ করে এই আন্দোলনকে চাপা দিতে চাইলে গর্জে ওঠে বাংলার যুবকরা - যার ফলশ্রুতি ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্লচাকী।

ভাষার জন্য বাঙালি যত রক্ত দিয়েছে ভারতীয় উপমহাদেশের আর কোন জাতি তা দেয়নি। আবু বরকত, কমলা ভট্টাচার্যরা প্রমাণ করে দিয়েছে বাঙালি ভাষার জন্য কি করতে পারে। ফুটবল নিয়ে বাঙালির আবেগও আমরা সবাই জানি।

দ্বিতীয়ত, বাঙালি মাতৃতান্ত্রিক জাতি। বাঙালিদের প্রধান আরাধ্যরা যেমন - দুর্গা, কালি, লক্ষ্মী, সরস্বতী, মনসা, সিতলা, ওলাইচণ্ডী প্রত্যেকেই নারী। দুর্গার চালায় শিব থাকেন প্রায় লোকচক্ষুর অন্তরালে। এখনো যে কোন মন্দিরে গেলে সে কালি মন্দির হোক বা দুর্গা মন্দির, দেখা যায় দেবী মন্দির অনেক বড় ও শিব মন্দির অনেক ছোট। বাঙালি মুসলিম সমাজে মা ফতেমার যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। দেশকে মাতৃকা রূপে পুজার মন্ত্র দেন বঙ্কিমচন্দ্র ও দেশমাতৃকার চিত্র অঙ্কন করেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। দেশ আমাদের কাছে মাতা। প্রাকআর্য যুগে বাংলায় কোন এক সময় মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ছিল। সেই ঐতিহ্য আজও বহমান। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তো মায়ের ডাকে দামোদর পেরোলেন আর 'বাংলার বাঘ' আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তো মায়ের আদেশ শিরধার্য করে 'কালাপানি' পার হয়ে বিদেশ গেলেন না। লর্ড কার্জন যখন আশুতোষকে বললেন — "Tell your mother that the Governor Genral of India Commands you to go" তখন আশুতোষ উত্তর দিলেন — "I refuse to be Commanded by the Governor General or anybody higher still". ক্ষুদিরাম মা তো শৈশবেই মারা গিয়েছিলেন। তিনি দিদির কাছে মানুষ হন। কিন্তু তাকে নিয়ে যখন রচিত হল বিখ্যাত ballard তখন তাও শুরু হল মাকে দিয়ে —

"একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি
আমি হাসি হাসি পড়ব ফাঁসি দেখবে ভারতবাসি।"

বিভিন্ন প্রবাদ যেমন -
"মামা-ভাগ্না যেখানে,
বিপদ নাই সেখানে'

বাঙালির মাতৃতান্ত্রিক অতীতের স্বাক্ষর বহন করে চলেছে।

তৃতীয়ত, বাঙালি সমন্বয়বাদি, সবাইকে সে আপন করে নিতে ভালোবাসে। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, আমরা 'আত্মীয়সম্বন্ধ' স্থাপন করতে ভালোবাসি। নিতান্ত অপরিচিত লোককেও আমরা দাদা, দিদি, কাকু, কাকিমা, মাসিমা, মেসোমশাই বলে সম্বোধন করি। ইউরোপ-আমেরিকা যারা নিজেদের আমাদের থেকে সভ্য বলে দাবি করে সেখানে অন্যকে সম্বোধন করা হয় মিস্টার অমুক বা মিসেস অমুক হিসাবে। অনেক সময় Sir / Madam বা Ladies and Gentleman হিসেবে সম্বোধন করা হয়। বিবেকানন্দ বাঙালি বলেই শিকাগো ধর্মমহাসভায় তার বক্তব্য শুরু করেছিলেন "Brother and Sisters of America" দিয়ে। করতালিতে ফেটে পড়েছিল সমগ্র হল। সূচনা হয়েছিল স্বামীজির বিশ্বজয়ের। যুগোবতার শ্রীরামকৃষ্ণ বাঙালি, তাই তিনি অবলিলায় বলতে পারেন - "যত মত তত পথ"। আমাদের কবি গান বাধেন —

"তোমরা কুঞ্জ সাজাও রে, আজ
আমার প্রণনাথ আসিতে কুসুমেরই
শয্যা পাত পবিত্র অন্তরে..."

কত সুন্দরভাবে কবি চুয়া চন্দন আর ইতর্ গোপালকে মিলিয়ে দিচ্ছেন। আর এক কবি লিখছেন — "হিন্দু না ওরা মুসলিম ওই জিজ্ঞাসে কোন জন কাণ্ডারি বল ডুবিছে মানুষ সন্তান মোর মার" বা

"মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম
হিন্দু-মুসলমান মুসলিম তার নয়নমণি
হিন্দু তাহার প্রাণ"

এই বাংলায় একই সঙ্গে পুজিত হন বনবিবি ও দক্ষিণরায়, সত্যনারায়ণ ও সত্যপির।

এটা ঠিক এই সমন্বয়বাদ থাকা সত্ত্বেও ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে ধর্মের ভিত্তিতে বাংলা বিভক্ত হল। অতীতেও রাজনৈতিকভাবে বাংলা বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত থেকেছে। কিন্তু ভাষা-সংস্কৃতির দিক থেকে বাঙালি এক। পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানি যদি এক হতে পারে তবে আমরা আসা করতেই পারি সমগ্র বাংলা আবার একদিন রাজনৈতিক ভাবে এক হবে। (শেষ)

# বালুচরী শাড়ির জন্মবৃত্তান্ত

(গত সংখ্যার পর)

আশুতোষ মিস্ত্রি

দুবরাজ দাস মারা যান ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দে।

তিনি মারা যাবার পর গঙ্গার বন্যায় বাহাদুরপুর গ্রাম বিধ্বস্ত হলে শিল্পীরা আশ্রয় নেন বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরে। সেখানে মল্লরাজাদের পৃষ্ঠপোষণে এই শিল্পের সমৃদ্ধি ঘটে। মল্লরাজাদের সময়ে নির্মিত টেরাকোটার মন্দির ও অন্যান্য শিল্পের প্রভাব পড়ে এই শাড়ির নক্সায়। পরে ব্রিটিশ জমানায় অন্যান্য দেশীয় বয়ন শিল্পের মত বালুচরী ও দুর্দশাগ্রস্ত হয়। ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দে বিখ্যাত চিত্রশিল্পী সুভগেন্দ্রনাথ (সুভো) ঠাকুরের উদ্যোগে এই শাড়ির বাণিজ্যিক বিস্তার ঘটে। তিনি তখনকার বিখ্যাত কারিগর অক্ষয় কুমার দাসকে রিজিওনাল ডিজাইনসেন্টারে (সুভো ঠাকুর -এর ডিরেক্টর ছিলেন)।

সাবেক জালা তাঁতের পরিবর্তে পরিবর্তে জ্যাকার্ড তাঁতের ব্যবহার শেখান। পরের বছর অক্ষয় দাস অজন্তা-ইলোরার মোটিফ লাগিয়ে নতুন বালুচরী বাজারে আনলে এই শিল্পের উত্থানঘটে। বালুচরী দৈর্ঘ্যে ১৫ ফুট লম্বা ও ৪২ ইঞ্চি চওড়া। আঁচলের দৈর্ঘ্য ২৪ থেকে ৩২ ইঞ্চি। গবেষিকা চিত্রাদেব বালুচরীর অলংকরণে চার ভাগে ভাগ করেছেন, যথাচিত্র, কল্কা, পাড় ও বুটি। তার মতে চিত্র অংশের নক্সা অন্যান্য শাড়িতে দেখা যায় না। রেশম বালুচরীতে নিত্যনতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে তৈরি হয়েছে অনেক ধরনের শাড়ি। এক বা দুই রঙের সাধারণ বালুচরী, রঙে ঝলমল মীনাকরী বালুচরী, গুরুদাসলক্ষ্মণ আবিষ্কৃত স্বর্ণচরী, অমিতাভ পালের সৃষ্টি রূপশালি ও মধুমতী, অমিত লক্ষ্মণের সৃষ্টি দ্রৌপদী বালুচরী ইত্যাদি নানাপ্রকারের শাড়ি তৈরি হয়। এই শাড়িগুলো মূলতঃ রেশম শাড়ি, যদিও পরে তুলো থেকে তাঁতের বালুচরী ও আজকাল বাঁশ, কলা ইত্যাদি গাছ থেকে পাওয়া সুতো থেকে জৈব বালুচরী ও বানানো হয়। একটি শাড়ি বানাতে দুজন কারিগর এক সপ্তাহ বা বেশি সময় লাগে। প্রথমে গুটিপোকা থেকে রেশম সংগৃহীত হয়, পরে তা সোডা ও গরম জলে সেদ্ধ করা হয় ও অ্যাসিড রহে চোবানো হয়। তারপর দুদিক দিয়ে টেনে টানটান করা হয়, যাতে সুতো দিয়ে কাপড় বোনা যায়। শাড়ির নক্সাগুলি কাগজে এঁকে পাঞ্চিং কার্ডের সাহায্যে শাড়িতে বসিয়ে দেওয়া হয়। আজকাল পরিবেশ বাঁচাতে নানা জৈব রঙ ব্যবহৃত হচ্ছে। বাঁকুড়া জেলা ও রেশম, এরওপর সরকারি ভৌগোলিক তকমাপড়ায় অন্যত্র অন্য জিনিসে তৈরি হলে বালুচরী নাম দেওয়া যাবেনা। জাতীয় পুরস্কার, শিল্পমেলা ইত্যাদির কারণে বাংলা ও ভারতের বাইরেও এখন এ শাড়ির খ্যাতি ব্যাপ্ত। ২০১৫ সালে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী লণ্ডন সফরের সময় রফতানি সংস্থা ও বিটিওলরাঅ্যাশলি কোম্পানির চুক্তি হয় ব্রিটেন ও জাপানের বাজারে লরাঅ্যাশশির দোকানে বালুচরী, শীতলপাটি ও অন্যান্য বঙ্গজ সামগ্রী বিক্রির, বিশ্ব বাংলা সংস্থার জোগানদারিতে। এসবের ফলে বর্তমানে বালুচরী শাড়ির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। (শেষ)

# নীল চাষ ও নীল বিদ্রোহ ঃ বারাসাত

**সৌরভ বারুই**

*(গত সংখ্যার পর)*

এই নির্দেশের সংবাদ সমস্ত জেলাগুলিতে রটে গেলে যশোর, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি জায়গা থেকে কৃষকরা দলে দলে এসে এই নির্দেশ লিখে নিয়ে যায়। ঠিক এই সময় ১৮৬০ সালে দীনবন্ধু মিত্রের লেখা ‘‘নীলদর্পণ’’ নাটকটি প্রকাশিত হয়। সকল শ্রেণীর বাঙ্গালী নীল চাষীদের প্রকৃত অবস্থা জানতে পারে। এরপর থেকে শুরু হয় প্রকৃত অর্থে নীলচাষ বিরোধী আন্দোলন। ১৮৬০ সালে জুন মাসে ‘‘কলকাতা রিভিউ’’-তে লেখা হয় যে, ‘‘রায়তকে আমরা ক্রীতদাস অথবা রাশিয়ার ভূমিদাসের মত গণ্য করে এসেছি, যাকে শুধুমাত্র জমির একটা অংশ হিসাবেই দেখেছি... সে আজ অবশেষে জাগ্রত ও সক্রিয় হয়ে উঠেছে, সে প্রতিজ্ঞা করেছে যে সে শৃঙ্খল মুক্ত হবেই’’।

১৮৬০ সালে নীল বিদ্রোহ এতটাই চরম পর্যায়ে চলে যায় যে, ওই বছর ৩১শে মার্চ কোম্পানি ৫ জন সদস্য নিয়ে চাষীদের অবস্থা ও কৃষকদের অভিযোগের জন্য নীল কমিশন (Indigo Commission) গঠন করে। এই কমিশন ১৮ই মে থেকে ১৪ই আগষ্ট পর্যন্ত ১৩৬ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করে ২৭শে আগষ্ট কমিশনে রিপোর্ট পেশ করে। নীল কমিশনের তদন্তের ফলে নীলকরদের অত্যাচারের কথা সরকারিভাবে প্রকাশিত হয়। ফলে নীলকরদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তিতে আঘাত পড়ে। সরকার, নীল কমিশন, ছোটোলাট ও নীলকর-রা মোটামুটি সিদ্ধান্তে আসেন যে, ‘‘নীল চাষে গভর্ণমেন্টের কোনো রকম হস্তক্ষেপ হলে তা, সমস্যাটিকে আরও জটিল করে তুলবে। ভালো ম্যাজিস্ট্রেট, ভালো জজ, ভালো পুলিশ নিয়োগ করাই হচ্ছে সরকারের কাজ’’। রিপোর্ট প্রকাশিত হবার পর সরকার শুধুমাত্র একটা ইস্তাহার জানিয়ে দেন যে, (১) সরকার নীল চাষের পক্ষে-বিপক্ষে নন; (২) অন্য শস্যের মত নীল করা বা না করা কৃষকের ইচ্ছাধীন; (৩) প্রজা কিংবা নীলকর যেই আইন অমান্য করবে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। এরপর বারাসতে নীল চাষীদের উপর আক্রমণ অনেক কমে যায়। Eden Indigo Commission.-এর কাছে বলেছিলেন, বারাসাত জেলা কলকাতার একেবারে নিকটে ছিল। অন্য যে কোনো জেলার চেয়ে এই জেলার কৃষকরা বেশি সজাগ। তারা ফরাজি আন্দোলন, তিতুমিরের নীল বিরোধী আন্দোলন সম্পর্কে জানত। সদর বারাসাত ম্যাজিস্ট্রেট ছাড়াও আর তিনজন ম্যাজিস্ট্রেট ছিল। ফলে কৃষকদের অভিযোগ জানাতে বেশিদূর যেতে হতনা। ফলে কমে এসেছিল চাষ। কিন্তু এরপরেও অন্য জেলায় যেমন যশোরে ১৮৮৯ সালে আবার নীল বিরোধী আন্দোলন চোখে পড়ে। এরপর ধীরে ধীরে চাষ কমে এলে ১৮৯৫ সালে সরকার নীল ব্যবসা তুলে নেয়।

নীল বিদ্রোহের ইতিহাসে বারাসাত যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ সে সম্পর্কে পাঠকের বুঝতে কোনো সমস্যা হয়নি। কিন্তু নীল বিদ্রোহের ইতিহাস বইগুলিতে বারাসাত তেমন স্থান পাইনি। Indigo Cultivation-এর Report-এ বারাসাতের নাম বার বার উঠে এসেছে। W. Hunter, O'Melly এবং আঞ্চলিক কিছু ইতিহাসবিদ ছাড়া আর কেউই এ বিষয়ে আলোকপাত করেনি। ‘‘অমৃতবাজার’’ পত্রিকায় শিশির ঘোষ লেখেন, নীল বিদ্রোহ ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের Blue Print তৈরি করে দিয়েছে। সে ব্যাপারে বারাসাত অঞ্চলের সাধারণ মানুষের যে অংশ আছে তা এই ধরনের বক্তব্য থেকে প্রমাণিত। *(শেষ)*

▸ ২ পৃষ্ঠার পর

# রেশম কথা

করেছেন। এই পথ দিয়ে রেশম সর্বপ্রথম আসে গৌরবঙ্গে। গৌরবঙ্গের ইতিহাস (গৌড়ের ইতিহাস-রজনীকান্ত চক্রবর্তী) থেকে জানা যায় প্রাচীন ও মধ্যযুগে কোন কোন ক্ষেত্রে গৌড় নামক জনপথের উল্লেখ আছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে গৌড় অর্থে বঙ্গ ও পৌন্ড্রকে বোঝান হত।

গৌড়র ইতিহাস থেকে জানা যায়, খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের কাছাকাছি সময়ে চীন জাতি মাঝে মধ্যে ব্রহ্মপুত্র এর করতয়া নদী পথে বঙ্গদেশ আক্রমণ করত। এই আক্রমণকারী চীনদেশীয় নৌবাহিনী মাঝি নামে খ্যাত ছিল। এই মাঝিদের মধ্যে কেউ কেউ বাংলাদেশ থেকে যান। মহাভারতে নানা স্থানে পুন্ড্রজাতির উল্লেখ আছে। ঐতেরীয় ব্রাহ্মণে উল্লেখ আছে বিশ্বমিত্রের পুত্র পুন্ড্র এর নাম থেকে পৌন্ড্র বা পুন্ড্র দেশের নাম হয়েছে। এই পুন্ড্র বলতে করতয়অ ও গঙ্গা নদীর মধ্যবর্তী স্থানকে বোঝানো হয়েছে। জৈন কল্পসূত্রেও পুন্ড্ররিক নামক প্রাচীন জাতীর উল্লেখ আছে।

বর্তমান মালদহ থেকে বগুড়া (বর্তমানে বাংলাদেশে) পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় একসময় প্রচুর পরিমাণে রেশম উৎপন্ন হত। এই রেশম চাষের সঙ্গে যুক্ত ছিল, প্রাচীন পুন্ড্রজাতী। এদের নাম থেকেই পলু শব্দের উৎপত্তি। এদের নাম থেকেই গৌরবঙ্গের এই অঞ্চলের নাম হয় পৌন্ড্র। এই পুন্ড্র বা পুন্ড্রদের জনপথকে কেন্দ্র করে সপ্তম শতকে গড়ে উঠেছিল পুন্ড্রবর্ধন রাজ্য। পরে পাল ও সেন রাজাদের আমলে এই রাজ্যের নামকরণ হয় পৌন্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তি বা পোন্ডুভক্তি। প্রাচীন পুন্ড্র বা পুন্ড্র জনপদ গড়ে উঠেছিল মালদহ, বগুড়া, দিনাজপুর, রাজশাহী, রংপুর জেলাকে কেন্দ্র করে।

*(ক্রমশ)*

▸ ৩ পৃষ্ঠার পর

# পৃথিবীর তিনটি রহস্যময় প্রত্নকীর্তি

শেষ হয়। প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর সাহায্য ব্যতীত ঐ বিপুল ওজনের পাথরগুলি অতদূরে বহন করে নিয়ে যাওয়া সেযুগে অবিশ্বাস্য মনে হয়। আর সেজন্যই জন্ম নিয়েছে এলিয়েনদের আগমনের তত্ত্ব। ভিন গ্রহের প্রাণিরা নাকি হেঞ্জ নির্মাণ করেছিল, প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে রোগ নিরাময় কেন্দ্র রূপে। কর্কট সংক্রান্তি ও মকর সংক্রান্তিতে সূর্যালোকের বিক্ষেপ দেখলে এমন সন্দেহ খুব অমূলক মনে হবেও না। সুতরাং জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত কাজকর্মের কেন্দ্র হিসেবেও স্টোনহেঞ্জের ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। তবে আধুনিক গবেষকদের মনে হয়েছে, বন্যা নির্মাণকালের শেষ পর্বে স্টোনহেঞ্জের ব্যবহার মূলত সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে পবিত্র সমাধিক্ষেত্র হিসেবে। প্রমাণ হিসেবে সম্প্রতি কয়েক বছরে স্টোনহেঞ্জে ৬৩টি মানব শরীরের হাড়ের টুকরো খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। সম্ভবত দূরবর্তী এলাকা থেকে লোকজন এই পবিত্র সমাধিস্থলে উপাসনার জন্যও আসতো। শাস্ত্রীয় আচার অনুষ্ঠান পালনের জন্য এর প্রসিদ্ধি ছিল। তাছাড়াও সেযুগে এটি মানমন্দির এবং ঋতু নির্ণয়ের কাজে ব্যবহৃত হতো। সূর্যাস্তের মুহূর্তে হেঞ্জের নীল পাথরগুলি রোগ নিরাময় ক্ষমতালাভের কাহিনি অবশ্য ভিত্তিহীন। ১৯৮৬ সালে ইউনেসকো এই স্থানটিকে ‘‘ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট’’ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। *(ক্রমশ)*

প্রধান সম্পাদিকা ও প্রকাশক - সহেলী চক্রবর্তী (৮৯৪২৯২৪২৩৪), প্রশ্নচিহ্ন হইতে প্রকাশিত।
উপদেষ্টামণ্ডলী - ড. অধ্যাপক রাজর্ষী চক্রবর্ত্তী, ড. স্বপন ঠাকুর, সুবিদ আবদুল্লা, ফারুক আবদুল্লা। অক্ষর বিন্যাস - শুভ্রজ্যোতি তালুকদার (৯৭৩৪৩১৪৫৬৮)